Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.2
Pages	২৯-৫৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

১

বাংলা ব্যাকরণের যে ছাঁচটি গত প্রায় দুশো বছর ধরে চর্চিত হচ্ছে, তার সূচনা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ফারসি ও ইংরেজির মাঝে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা চালুর একটা চিন্তাভাবনা শাসকপক্ষ করেছিল। কিন্তু বিদেশিদের জন্য সুবিধাজনক 'প্রমিত' রূপ বাংলার ছিল না। বাংলার ঔপভাষিক বৈচিত্র্য স্বভাবতই তাঁদের কাছে বিব্রতকর ছিল। এমতাবস্থায় সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা ভাষার একটা মান্যরূপ তৈরির প্রকল্প বিদেশি শাসকদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ সেই প্রয়োজনীয়তারই বাস্তবায়ন।

হ্যালহেডই তাঁর ক্লাসিক-নির্ভরতা আর ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতায় এই পথের দিশা দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (Qayyum 1982 : 71) বহু সাক্ষ্যপ্রমাণযোগে দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষায় হ্যালহেডের দখল ছিল অতি সীমিত। তাঁর পক্ষে বাংলা ব্যাকরণ লিখে ফেলা সম্ভব ছিল কেবল ধ্রুপদী সংস্কৃতের ছাঁচে ফেলে।[১] তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাকে 'সরল' ও 'বিশুদ্ধ' করতে। একজন বিভাষীর জন্য এই সারল্য দরকার। কিছু সরল ধাতু শিখে তাদের বিচিত্র ব্যবহার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী করে একটি বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করার চিন্তায় হ্যালহেডের সায় থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথ্য-বাংলায় কোনো দখল না থাকায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকায় বাংলার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি এমনসব ভুল করেছেন, যা বাংলার সঙ্গে পরিচিত কোনো বিশ্লেষক করবেন না (Qayyum 1982 : 99-102)। তাঁর পুস্তকে প্রচলিত ভাষা থেকে সংগৃহীত কোনো উদাহরণ ব্যবহৃত হয়নি। তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন পুরোনো কবিতা থেকে। ফলে তিনি কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা — এই ক্রমে বাংলা বাক্য গঠিত হয়, এমন ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এ ব্যাকরণে 'নিঃশ্বাস' শব্দের উচ্চারণ লেখা হয়েছে 'niswas', যা বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ই/ঈ, উ/ঊ, স/ষ/শ, জ/য ইত্যাদি যত ক্ষেত্রে বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন সংস্কৃত থেকে বাংলাকে আলাদা করেছে, তার সবক্ষেত্রেই এই ব্যাকরণ সংস্কৃত উচ্চারণকেই বাংলা উচ্চারণ বলে উল্লেখ করেছে। শুধু তাই নয়। শব্দগত যেসব উপাদানের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগ পাওয়া যায়নি সেগুলোকে বাংলা থেকে বাতিলও করে দিয়েছেন তিনি। নিজের ব্যবহারের জন্য বানানো ফারসি-বাংলা শব্দকোষে হ্যালহেড ১৫০টি ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র ৩২টি স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যাকরণে। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় এই বিপুলসংখ্যক ক্রিয়াপদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উইলিয়াম কেরি তাঁর ব্যাকরণে (১৮০১) হ্যালহেডের ঋণ স্বীকার করেছেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণটি আগেই তাঁর হাতে পড়েছিল। জাহাজে আসার সময়ে বা তার আগেও বাংলা শেখার কাজে তিনি এই ব্যাকরণ ব্যবহার করেছিলেন (Qayyum 1982 : 141-42)। তুলনামূলকভাবে ভালো বাংলা জানতেন বলে হ্যালহেডের ছাঁচের মধ্যে থেকে বা ছাঁচের বাইরে গিয়ে চলতি বাংলার কিছু বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ তিনি সংযোজন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৮০৫-এ প্রকাশিত এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে চলতি উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়; আর সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে তিনি এই ব্যাকরণকে তাঁর ভাষায় 'a new work' হিসাবে রচনা করেন (নির্মল ২০০০ : ১০০; Qayyum 1982 : 161-64)। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম এই দ্বিতীয় সংস্করণে গভীরতর সংস্কৃতায়নের বহু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন (Qayyum 1982 : 165-66), এতে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ঢুকেছে, প্রথম সংস্করণের অনেক চালু শব্দ পরিত্যক্ত হয়েছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষার পরিমাণও অনেক বেড়েছে। প্রথম সংস্করণে কোথাও কোথাও সংস্কৃত-রীতি উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, বাংলায় এগুলো আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃতের কোনো উল্লেখ ছাড়াই বাংলার ক্ষেত্রে তা হুবহু চালানো হয়েছে। সংস্কৃতায়নের মাত্রা উপলব্ধি করা যাবে উচ্চারণ নির্দেশের পার্থক্য থেকেও। প্রথম সংস্করণে লেখা হয়েছে, বাংলা শব্দ 'nisvas' 'nishwas' হিসাবে উচ্চারিত হয় না, উচ্চারিত হয় 'nishshas'-রূপে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে 'nishwas'-ই শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। বাঙালিরা যে উচ্চারণ করে তা ভুল। ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতায়নের এই ধারা এ ব্যাকরণের পরের সংস্করণগুলোতেও অব্যাহত ছিল (নির্মল ২০০০ : ১১৭-১২২)।

২

ইউরোপীয়দের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয়ের পর নিজ প্রয়োজনে ইউরোপীয়রা বাংলা ভাষা অন্তত আংশিকভাবে আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়। নইলে তাদের ব্যবসাপাতির অসুবিধা হত। তাদের প্রয়োজন ছিল 'ভাষার কতকগুলি শব্দ, প্রকাশভঙ্গি, অভ্যস্ত ধরন, রশিদ-পাট্টা-চুক্তি-জামিন-কবলা ইত্যাদির আকার, পারিবারিক-সামাজিক-ব্যবসায়িক জীবনে পারস্পরিক সম্বন্ধজ্ঞান ইত্যাদি আয়ত্ত করা' (দেবেশ ১৯৮৭ : ১৪)। ১৭৭০-এর দশকে ইংরেজদের প্রয়োজনে সংকলিত দুটি শব্দকোষ (সরস্বতী ২০০০ : ৩৪-৩৭) পরীক্ষা করলে এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়। এসব শব্দকোষে চালু শব্দেরই প্রাধান্য ছিল — দেশজ, আঞ্চলিক, আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দ নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। চালু ভাষা রপ্ত করতে হলে এর বাইরে যাওয়ার উপায়ও থাকে না। কিন্তু ভাষা যখন যুক্ত হয়ে পড়ে ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সঙ্গে,[২] তখন ভাষা 'কেমন' — এই প্রশ্ন আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না; বিবেচ্য হয় 'কী হওয়া উচিত'। সংস্কৃতের আদলে বাংলাকে 'বিশুদ্ধ' করার জ্ঞানগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে 'কী হওয়া উচিত' প্রশ্নের একটা সুরাহা হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে 'যাবনী মিশাল' চলতি বাংলা, এমনকি সাধারণ্যে চালু বাংলা কখনো গ্রহণ করেননি, তার বেশুমার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চালু বাংলাকে 'বিশুদ্ধ' করার একটা প্রকল্প তাঁদের থাকাই স্বাভাবিক। প্রকল্পের এই ঐক্য উপনিবেশায়নের ওই বিশেষ পর্বে তৈরি করেছে সাহেব-পণ্ডিত ঐক্য।

বাংলা ভাষাচর্চার সঙ্গে যুক্ত অন্তত চারজন — ফরস্টার, উইলকিন্স, কেরি ও কোলব্রুক — সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেছিলেন (Qayyum 1982 : 16-19)। চর্চার এই বিশেষ ধরনের জন্যই ইংরেজদের নিয়োগকৃত মুনশির পদে সংস্কৃতজানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আবদুল কাইউম (1982 : 53-55) জানাচ্ছেন, হ্যালহেডের একজন পূর্ববঙ্গীয় মুনশি ছিল, যাঁর কাছে তিনি ফারসি ও হিন্দুস্থানি শিখতেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে স্থানচ্যুত করে ব্যাকরণ রচনার সহায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত — হ্যালহেডের ভাষায়, 'বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ'। এই পণ্ডিতের কাছ থেকে শেখা বানান, উচ্চারণ আর প্রত্যক্ষরীকরণ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় নিষ্পন্ন সংস্কৃতায়ন আসলে কিভাবে কাজ করেছিল। আবদুল কাইউম এর অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছেন। এখানে একটি উদ্ধৃত করা হল :

> The average, educated Bengali of the present day would pronounce the Sanskrit words *Mahadeva*, *Siva* and *Devata* as *Mahadeb*, *Shib* and *Debata*; the Sanskrit voiced labiodental 'v' becomes in Bengali a voiced labial plosive 'b'. In the 'Ancient and Authentic' book-list, however, Halhed transcribes these words phonetically as *Mahadev*, *Shev* and *Dewta* thus retaining a suggestion of the 'v' pronounced by the Bengali Brahmin, whose speech undoubtedly bore the deep imprint of his long training in Sanskrit. (Qayyum 1982 : 57)

পণ্ডিতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া হ্যালহেডের উপায়ও ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, তিনি বাংলা শিখেছিলেন অতি সামান্য, আর খুব ভালো সংস্কৃতও শিখে উঠতে পারেননি। সাহেব জানতেন, 'বিশুদ্ধ' বাংলা কেমন হবে, জানতেন ভাষা-বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি। আর তাঁকে উপাত্ত সরবরাহ করেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দুজনের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ছিল না।[৩]

৩

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কোনো চলতি বা আদর্শ ভাষার ভিত্তিতে ব্যাকরণ-প্রণয়নের ব্যাপারটা ঘটেনি। সংস্কৃত ও ইংরেজির ছাঁচে এক কল্পিত আদর্শের বরাতে ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। সেই তত্ত্বের প্রাথমিক রূপায়ণে বাঙালি পণ্ডিতদের হাত ছিল। কিন্তু, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, মূল কাজটা হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান আর সক্রিয়তায়। সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় গড়ে ওঠা এই তত্ত্ব পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় হুবহু পুনরাবৃত্ত হতে থাকে পুরো উনিশ শতক জুড়ে। এমনকি পরেও, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে, কিছু সংযোজন-বিয়োজনসহ বাংলা ভাষা-ব্যাখ্যার ওই মূল ছাঁচ অক্ষুণ্ন থেকে যায়।

এই পারস্পরিকতা জেঁকে না বসলে বাংলা ব্যাকরণের রূপ কী হতে পারত, তার কিঞ্চিৎ নমুনা পাওয়া যায় মানোএল দা আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণে। তাঁর ব্যাকরণে অসংগতি বিস্তর। অসংগতির অন্যতম কারণ লাতিনের সঙ্গে বাংলাকে মিলিয়ে পড়ার অবাস্তব বাসনা (নির্মল ২০০০ : ২৫-২৬)। কিন্তু অঞ্চলবিশেষের মুখের ভাষা অবলম্বন

করায় বাংলা ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তিনি সাফল্যও দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষার লিঙ্গ ও বচন-বৈশিষ্ট্য তিনি ঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছেন (নির্মল ২০০০ : ২৯-৩০), পরের বহু ব্যাকরণে যেক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি দেখা গেছে। তাঁর ব্যাকরণে পাওয়া যায় 'যে জন ভাল হএ, ভাল কার্য্য করিয়া তে জন স্বর্গে যায়'-ধরনের বাক্য, পদক্রমের স্বাভাবিকতা ও শৃঙ্খলায় যেগুলো বাংলা বাক্যের পুরোনো সুষ্ঠুতার নজির হয়ে আছে (মানোএল ১৯৩১ : ২২; সিরাজুদ্দীন ২০০৬ : ১৪৮)।[৪] এসবই আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণের প্রগতিশীলতা। তার ভিত কাঁচা, কিন্তু খাঁটি। এই ভিতের আশ্রয়ে বাংলা ব্যাকরণের প্রগতি হতে পারত। হ্যালহেড এই পথ পরিহার করে আশ্রয় নিয়েছিলেন সংস্কৃতের। কেরির ধারাবাহিক সাধনায় বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ছাঁচের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

আসলে একে শুধু ছাঁচ বলাও মুশকিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদই বাংলা ব্যাকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ১৭৯৮ সালের ১৬ জানুয়ারি এক চিঠিতে উইলিয়াম কেরি সাটক্লিফকে জানিয়েছেন, তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের ইংরেজি অনুবাদ করছেন (নৈঋতা ২০১০ : ১৩৩)। এই সূত্রে পরবর্তীকালে জানা যায়, যে ব্যাকরণটি তিনি অনুবাদ করছিলেন তা ছিল বোপদেবের *মুগ্ধবোধ* ব্যাকরণ। নৈঋতা ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন, কেরির ব্যাকরণের বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনাংশ আর উদাহরণ নেওয়া হয়েছে *মুগ্ধবোধ* ব্যাকরণ থেকে। এ ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮০৫) পরবর্তী বাংলা ব্যাকরণের আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, বাংলা স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ আসলে *মুগ্ধবোধের*ই উত্তরসূরি (নৈঋতা ২০১০ : ১৩২)। ভাষা-বর্ণনার সূক্ষ্মতা আর সমগ্রতায় সংস্কৃত ব্যাকরণধারার জুড়ি নেই। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ সেই ঐশ্বর্যের ভাগ পায়নি। ভাষা-বর্ণনার মূলনীতি বা দার্শনিকতার অনুসরণ না করে বাংলা ব্যাকরণে হুবহু বর্ণিত-বিষয় ও উদাহরণ গ্রহণ করায় এই ঋণ বোঝা হয়েই এসেছে, সম্পদ হয়ে ওঠেনি। বিপরীতে, সংস্কৃত ব্যাকরণের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গী হয়েছে। ওই ব্যাকরণচর্চার মূলে ছিল দেবভাষার শুদ্ধতা নিশ্চিত করা। তাই ভাষার প্রগতি বা বিবর্তনের তুলনায় ভাষার বিশুদ্ধিগত চিরন্তন মান বা আদর্শ সংস্থানের ব্যাপারেই সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন (নির্মল ২০০০ : ৩)। এ কারণেই সংস্কৃত ব্যাকরণ মোটের ওপর ঔচিত্যমূলক। বাংলা ব্যাকরণে এই বৈশিষ্ট্যের অনুবর্তন দেখা যায়। তাছাড়া, গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চর্চার বিশেষ ধরনের কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টতার বদলে অকারণ দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে (সিরাজুদ্দীন ২০০৬ : ১৫২)। সংস্কৃত এক অর্থে গোষ্ঠীভাষা, এর ব্যাকরণও ছিল গোষ্ঠীবিশেষের পাঠ্য। উপনিবেশিত বাঙালি অভিজাতশ্রেণিও প্রায় অনুরূপ জনবিচ্ছিন্নতার শিকার। এ বাস্তবতায় সংস্কৃত ব্যাকরণের ও আলোচ্য ভাষার সংকীর্ণতা নিয়ে কলকাতায় কোনো আপত্তি ওঠেনি। এখানেও সমাজের ক্ষুদ্র অংশের ভাষা নিয়েই চলেছে ব্যাকরণের কায়কারবার — তাদের মুখের ভাষা নয়, কেবল লেখার আদর্শ ভাষা নিয়ে ব্যাকরণ লেখা হয়েছে (সিরাজুদ্দীন ২০০৬ : ১৪৮)।

প্রধানত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ হিসাবে উনিশ শতকে একের পর এক ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাকরণগুলো জড়িয়ে পড়েছে এক দুষ্টচক্রে : ছাত্রদের 'প্রাকৃত তথা লৌকিক'

বাংলা না শিখিয়ে শেখানো হত 'একটি পুনর্গঠিত শিষ্টরূপ', যে 'পুনর্গঠনের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা' (নির্মল ২০০০ : ১৫৫)। এই সংস্কৃতায়িত ভাষার ব্যাকরণ স্বভাবতই সংস্কৃত ব্যাকরণের হুবহু অনুকরণ হত। বিপরীতে সেই ব্যাকরণ থেকে ছাত্ররা সংস্কৃতায়িত বাংলা শিখত। তত্ত্ব এভাবে চর্চার এক অনমনীয় শৃঙ্খল তৈরি করে।[৫] ভগবচ্চন্দ্র (ভগবানচন্দ্র) বিশারদ ১৮৪০ সালে প্রকাশ করেন *সাধু ভাষার ব্যাকরণ সার সংগ্রহ*। ভূমিকায় তিনি বলেছেন (নির্মল ২০০০ : ১৭৫-৭৬), আদিতে ভারতে সংস্কৃতের উত্তম চর্চা ছিল, বোপদেবাদি বৈয়াকরণেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন, অতঃপর মুসলমান আক্রমণের পর থেকে দেশে ফারসির প্রভাব বর্ধিত হয় এবং সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। বর্তমানে সরকার ফারসি বর্জন করে সাধুভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। 'অতএব ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে অত্যাবশ্যক, কারণ সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত সাধুভাষা রচনাদি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন এবং ঐ সংস্কৃতভাষাও এমত কঠিন যে তাহাতে বহুতর পরিশ্রম ব্যতিরেকে সুন্দররূপে শিক্ষাসিদ্ধি সম্ভাব্য নহে এবং অন্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান এককালে কৃতিসাধ্য করা অসাধ্য'। ভূমিকায় লেখকের যে সংকল্প, রচনায় তিনি তা সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ বইটি আগাগোড়া সংস্কৃত ব্যাকরণের ঢঙে লিখিত। সূত্রে সংহতির প্রয়োজনে বাংলা ভাষার পক্ষে অনুপযোগী সমাস, সন্ধিবদ্ধ পদ ও লিঙ্গ-সাপেক্ষ বিশেষণ ব্যবহারেও তিনি দ্বিধা করেননি (নির্মল ২০০০ : ১৭৬)। একই বছর ব্রজকিশোর গুপ্ত *বঙ্গভাষা ব্যাকরণ* নামে একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই ব্যাকরণ একপ্রকার সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়াস্বরূপ অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণে যে২ প্রকরণ যে২ রীত্যনুসারে লিখিত আছে ইহাতেও প্রায় তত্তৎ প্রকরণ তত্তদ্‌রীত্যনুসারে লিখিত হইল' (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০ : ১৮২)। ব্রজকিশোর অবশ্য বাংলার লৌকিক রূপটিকেও স্বীকার করে নিয়ে তাকে সংস্কৃতরীতিতে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি ভূমিকায় যা বলেছেন, তা ওই যুগের বাংলা ভাষা-পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি লিখেছেন :

> যদ্যপি ভদ্র সমাজে কেবল সাধু ভাষার লেখন আলাপনাদি প্রশংসনীয় এবং ভাষার লেখনাদি ঘৃণিত হয় তথাপি বহুজনের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বদেশীয় ভাষাকে ঘৃণা না করিয়া আমি সংস্কৃত ভাষার রীত্যনুসারে তাহার রীতিবদ্ধ করিয়া অনেক২ ভাষা কথা লিখিলাম, বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমার এই দোষ ক্ষমা করিবেন। (উদ্ধৃত, নির্মল ২০০০ : ১৮২)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ ধরনের ব্যাকরণকেই বলেছেন 'Grammars of Sanskrit masquerading as Bengali grammar, in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgur (asadhu) beside the so-called 'polite' (sadhu) forms borrowed from Sanskrit.' (Chatterji 2002 : xv) অথচ অন্য উদাহরণও হাতের কাছে ছিল। বাঙালির মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা রামমোহন রায় বাংলা ভাষা-বর্ণনার তত্ত্বও প্রস্তাব করেছিলেন। 'বাংলা ভাষার সূত্রগুলো বিশ্লেষণ ও ভাষিক উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অবস্থান ও প্রকৃতি চিহ্নিতকরণে এবং সেক্ষেত্রে পরিভাষার ব্যবহারে বিদেশিদের ভ্রান্ত প্রক্রিয়া এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের নীতি প্রয়োগ তিনি সমর্থন করেননি' (মনিরুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬১)। ফলে তাঁর ব্যাকরণ থেকে

সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা বাদ পড়ে, আগ্রহীদের তিনি সন্ধির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ার পরামর্শ দেন; করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও সম্বোধন পরিহার করে বাংলা কারকব্যাখ্যার আলাদা তরিকা প্রস্তাব করেন; স্ত্রীপ্রত্যয় এবং অপরাপর কিছু প্রত্যয়ের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যাখ্যা হাজির করেন। তারচেয়ে বড় কথা, কিছু সংস্কৃত উপাদান যে বাংলা ভাষায় বাংলার প্রকৃতিই মেনে চলে — এ সত্যও তিনি দেখিয়ে দেন (নির্মল ২০০০ : ১৩৭-৪২)। কিন্তু রামমোহনের ব্যাকরণের এসব 'বাংলামি' — তিনি নিজে অভিজাত সমাজের প্রতাপশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও — গৃহীত হয়নি। স্কুলে পড়ানোর জন্য তাঁর ব্যাকরণের একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে 'রামমোহনের মৌলিকতা অনেকক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে তদানীন্তন বিদ্যালয়পাঠ্য অন্যান্য বাংলা ব্যাকরণের ছাঁচে ব্যাকরণখানির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে' (নির্মল ২০০০ : ১৭১)। পরের দশকগুলোতে — ১৯০০ সালের আশপাশটায় নবব্যাকরণ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত — বৈয়াকরণ রামমোহন তাঁর বই ও তত্ত্বসহ পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন।[৬]

আরো কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণ এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে, ১৮৫২ সালে বাংলা সংস্করণ। এই বইতে প্রথমবারের মতো শিষ্ট বাংলার পাশাপাশি লৌকিক কথ্যরূপের পরিচয় দেওয়া হয় (নির্মল ২০০০ : ১৯৪)। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু কথ্যভাষার আলোচনাই স্থান পেয়েছে। এমনকি কথোপকথনের ভাষার আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যও — যা বাংলা ভাষার লিখিত রূপে নেই — তিনি সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। বইটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল, জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরসহ পণ্ডিতসমাজে এই ব্যাকরণ প্রত্যাখ্যাত হয় (Qayyum 1982 : 244)। আরেকটি ব্যাকরণের খবর দিয়েছেন প্রবাল দাশগুপ্ত (১৩৯৪) — লোহারাম শিরোরত্নের *বাঙ্গলা ব্যাকরণ*। এই বইটি ১৮৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বেশ জনপ্রিয় এই ব্যাকরণে লোহারাম সংস্কৃতের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন এবং সূত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ও অন্য উপাদান আমদানি করেন। কিন্তু, প্রবাল দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, বহুক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই তিনি দারুণ সব মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়ে ব্যাকরণে প্রগতির রাস্তা তৈরি করেন, যেগুলো পরে আর অনুসৃত হয়নি। কেন? কেন বিভিন্ন ব্যাকরণের 'প্রগতিশীল' উপাদানগুলো অনুসৃত হয়নি? বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস-রচয়িতা নির্মল দাশ (২০০০ : ১৫৭) এর কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা পড়াতেন নর্মাল স্কুলের ছাত্ররা, যে স্কুল সংস্কৃত কলেজের অঙ্গীভূত। ব্যাকরণ বইয়ের লেখকও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত। এ কারণেই 'উনিশ শতকের অনেক ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায় বঙ্গানুবাদে পর্যবসিত হয়েছে'। আর 'যেখানে ব্যক্তিবিশেষের উদারতায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে সেখানে সেই উদার ব্যতিক্রম পণ্ডিত মহলে প্রবলভাবে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়েছে'। তথ্যের দিক থেকে নির্মল দাশের এই বয়ান সম্ভবত ঠিকই আছে। কিন্তু এতে ফলকে হাজির করা হয়েছে কারণরূপে। আদতে সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা যে বাংলা ভাষার

একচ্ছত্র অভিভাবক হয়ে উঠল, তার পেছনে তো আছে এই ধারণা যে, বাংলা একটি 'অনুন্নত' ও 'অমার্জিত' ভাষা, আর কেবল সংস্কৃতায়নের মাধ্যমেই বাংলার 'বিশুদ্ধ' রূপ পাওয়া সম্ভব। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে এ ধারণাকে কার্যকরভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ করেননি।

৪

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ Bengali, Spoken and Written প্রকাশিত হয় *ক্যালকাটা রিভিয়্যু* পত্রিকায়, ১৮৭৭ সালে। এ প্রবন্ধকে বলা যায় উপনিবেশিত বাংলা ভাষার বি-উপনিবেশায়নের প্রথম বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের সারকথা বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের 'স্বাধিকার-স্বায়ত্তশাসন'। এ ধারায় ক্রমে আবির্ভূত হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ — হুমায়ুন আজাদ যাঁদের চিহ্নিত করেছেন 'নবব্যাকরণবিদ' এবং 'বাঙলাপন্থী' হিসাবে (হুমায়ুন ২০০২ : ৩৯)। এঁরা প্রত্যেকেই বর্ণনামূলক কেতায় বাংলা ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন। আবিষ্কার করেছেন বাংলা ভাষাব্যাখ্যার বহু আভ্যন্তর সূত্র ও প্রণালিপদ্ধতি। এই প্রগতিশীল চর্চা যদি অব্যাহত থাকত, তাহলে বাংলা ব্যাকরণের বহু-কাঙ্ক্ষিত প্রগতি ইতোমধ্যেই অর্জিত হত। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে নতুন সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই প্রগতি রুদ্ধ হয়। সংস্কৃতায়নের বেশে বাংলা ব্যাকরণের ঔপনিবেশিক মডেল আবার রাজত্ব করতে থাকে।

ফলে রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের চর্চায় বাংলা ভাষাচর্চার যে অগ্রগতি হয়েছিল তার কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। এর সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যাবে বিশ শতকের প্রভাবশালী বাংলা ব্যাকরণগুলোতে। হুমায়ুন আজাদ লক্ষ করেছেন : 'বিশশতকে রচিত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকগুলো প্রকৃতি-প্রণালিতে উনিশশতকী ব্যাকরণই, যদিও কোনোকোনোটি বেশ ব্যাপক' (হুমায়ুন ২০০২ : ৩৮)। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের* কথা মনে রেখে এ মন্তব্য করেছেন। এ ব্যাকরণটি বেরিয়েছিল ১৯৩৯ সালে। ১৯২৬ সালের *ODBL* আর ১৯৩৯ সালের এ ব্যাকরণ মিলিয়ে পড়লেই আগের জমানার 'প্রগতিশীলতা' আর পরের 'পশ্চাৎপদতা' সহজে শনাক্ত করা যায়। *ODBL*-এ ছাঁচের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রাকৃত উপাদানের বহুলতা ছিল। কিন্তু *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ* কাজ করেছে প্রধানত বাংলার 'তৎসম' উপাদান নিয়ে; অধ্যায়গুলোতে পরিশিষ্টের মতো করে 'বাংলা' উপাদানের আলোচনা যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধ্বনি, সন্ধি, প্রত্যয় ইত্যাদির আলোচনা পাঠ করা যায়। দেখা যাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত উপাদান ও নিয়মকে মূল ধরে বাংলা উপাদানগুলোকে দেখানো হয়েছে বিচ্যুতি হিসাবে। তাই বাংলায় কখনো ব্যবহৃত হয়নি, এমন বর্ণ বা ধ্বনির আলোচনা তাতে পাওয়া যায়। সন্ধি-অংশে পাওয়া যায় এমন বহু শব্দ যেগুলো কোনো অর্থেই বাংলা শব্দ নয়। প্রত্যয় হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে খাঁটি সংস্কৃত রূপ, যার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণভঙ্গি ও শব্দরূপনির্মিতির কোনো সম্পর্ক কখনোই ছিল না। খানিকটা দ্বিধা সত্ত্বেও কারকের

তালিকায় 'সম্প্রদান' থেকে যায়, যা বাংলা ভাষার অনেক পুরোনো ব্যাকরণে বাদ পড়েছিল (প্রবাল ১৩৯৪ : ২৩৭)। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক আরো অনেকের আলোচনা সুনীতিকুমার আমলে আনেননি। রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, ইঙ্গিতমূলক শব্দ, বহুবচন ও লিঙ্গের চিহ্ন সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রায় কিছুই এ ব্যাকরণে গৃহীত হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে অধ্যায়-বিভাজনের যে রীতি বাংলা ব্যাকরণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সুনীতিকুমার প্রায় হুবহু তার অনুসরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, 'এই ব্যাকরণে সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষাও স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধুর আসনই মুখ্য। ব্যাকরণটি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার রূপও সাধু। বস্তুত তাঁহার নিজের পক্ষপাত সাধুর দিকেই' (বিজন ১৯৭৭ : ১৭১)। অথচ আগের বছর, ১৯৩৮ সালেই বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *বাংলাভাষা-পরিচয়*, যা চলিতরীতির ভিত্তিতে রচিত। তাই 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ', শৃঙ্খলা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ ব্যাকরণ বাংলা ভাষাচর্চায় কোনো নতুন পথ তৈরি করেনি। আদতে এ ব্যাকরণ সংস্কৃতরীতিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখার দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে চরম প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল; কারণ, 'বাজারের ব্যাকরণগুলিতে স্বভাবতই সুনীতিবাবুর অনুসরণ দেখা যায়'। (বিজন ১৯৭৭ : ১৭১)

'নবব্যাকরণবিদ'রা বাংলা ব্যাকরণের যে ধরন প্রস্তাব করেছিলেন, সুনীতিকুমার যে মোটেই তার অনুসরণ করেননি, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আরেক ভাষাতাত্ত্বিক-বৈয়াকরণ সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন: 'শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান মনীষী সংশোধনের অথবা প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন-কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ' (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৩)। উদাহরণ এবং কারণও জানিয়েছেন সুকুমার সেন :

> বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকেরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘন্ট পাক করে গেছেন তা এখনো বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমিও, সুনীতিবাবুর মতো। সুনীতিবাবুর সঙ্গে মিলে আমিও একদা স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলুম। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি এ কথাও জোর করে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। সেই বই শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কখনোই পঠন-পাঠনযোগ্য বলে সমর্থন করতেন না। (হরপ্রসাদ ২০০০/বি: ৬০৩)

সুকুমার সেনের এ বয়ান সংস্কৃতপন্থীদের সংখ্যাধিক্য এবং শক্ত ভিত্তির কথা বলে। সুনীতিকুমার এবং তিনি নিজেও আসলে সেই প্রতাপশালী কাঠামোকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তার প্রমাণ এই যে, তাঁরা স্বাধীনভাবে 'অন্যরকম' কোনো ব্যাকরণ রচনা করেননি। সুনীতি-সুকুমারের ব্যাকরণ বাংলাভাষীরা গ্রহণ করত না — সাধারণভাবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কৃতায়নের বিরোধিতাকারীদের — যাঁদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের সুনীতিকুমারও পড়বেন — একজনও সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনো বিরূপতা

দেখাননি। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ভাষাতত্ত্বসম্মত। তবু বিপরীত ধারারই প্রতিষ্ঠা ঘটল। সে প্রতিষ্ঠা কত প্রবল আর কার্যকর, তা বোঝার জন্য অনেক পরে প্রকাশিত আরেকটি ব্যাকরণগ্রন্থের পর্যালোচনা করা যাক।

জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। সরস কথ্যভঙ্গিতে রচিত ব্যাকরণটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু এর যে কোনো অংশ পড়লেই বোঝা যায়, এটি বর্ণনামূলক নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আনুশাসনিক। সে অনুশাসন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রচলিত বিভাজন তিনি মেনে নিয়েছেন; তবে তাতে সংস্কৃত শব্দের পরিসর আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তৎসম শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, ''সংস্কৃতের মতো' বলতে বুঝতে হবে উচ্চারণে তফাত হলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত থাকছে তা' (জ্যোতি ২০০১ : ২৭)। এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিচয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেকের উত্থাপিত মূল প্রশ্ন — বাংলায় আগত সংস্কৃত শব্দগুলো আসলে কেবল দেখায় অর্থাৎ বানানে তৎসম, বলায় বা উচ্চারণে নয় — তিনি এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে পুরো বইতে ব্যবহার করেছেন বিপুল সংস্কৃত শব্দ, যেগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। 'প্রতিশব্দ' অনুচ্ছেদে (জ্যোতি ২০০১: ২৮) অগ্নি ও অগ্নিবাচক শব্দের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে তনূনপাৎ, চিত্রভানু, বিভাবসু, কৃপীটযোনি, বায়ুসখ, হুতভুক্, হুতাশন, হব্যবাহন, বীতিহোত্র, বহ্নি, পাবক ইত্যাদি। বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা, তাঁর মতে, ১৪টি। 'ধ্বনি বর্ণ উচ্চারণ' শিরোনামের অধ্যায়টিতে বাংলা ভাষার এ বৈয়াকরণ সংস্কৃত উচ্চারণকে নির্দেশ করেছেন মূল-উচ্চারণ হিসাবে; আর বাংলা উচ্চারণ দিয়েছেন তার বিকৃতি হিসাবে। ষত্ব ও ণত্ব বিধান, সন্ধি, প্রত্যয় ও উপসর্গসহ প্রায় সকল অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে এমন নিয়ম, যার অনুকূলে বাংলা ভাষা থেকে কোনো উদাহরণই দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে প্রত্যয়ের আলোচনা সবচেয়ে সুলিখিত; কারণ এ অধ্যায়ের সূত্রগুলো প্রত্যয়ের রূপসহ হুবহু সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে। অব্যয় কিংবা উপসর্গের মতো অধ্যায়ের আলোচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভালো ধরা পড়ে। এই পরিভাষাগুলো বাংলায় হুবহু সংস্কৃতের মতো নয়। জ্যোতিভূষণ এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত সংজ্ঞা-অনুযায়ী আলোচনা করে পরে বাংলার ব্যতিক্রম নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থটির একটি পৃথক অংশে পশ্চিমা ব্যাকরণচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল আলোচনায় তার কোনো ব্যবহার নেই। তা সম্ভবও ছিল না, হয়ত দরকারও ছিল না। লেখক নতুন ভাষায় পুরোনো ব্যাকরণই লিখতে চেয়েছেন। ভূমিকায় অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন: 'নতুন করে ব্যাকরণটি লিখতে চেষ্টা করেছি বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনকে সর্বদা মনের মধ্যে রেখে'। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* কার্যত *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের* একটি আধুনিক সংস্করণ হয়েছে; সুকুমার সেনের ছায়াও হয়ত এতে পাওয়া যাবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রস্তাব পরোক্ষভাবেও এতে অনুসৃত হয়নি। এ ব্যাকরণও 'প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হয়ে উঠতে পারেনি'। (পবিত্র ২০০৩ : ১৪৬)

৫

'নবব্যাকরণবিদ'দের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইয়ের প্রবন্ধগুলো নতুন প্রণালির ব্যাকরণেরই প্রস্তাব, যদিও তার সজ্ঞা ব্যাকরণগ্রন্থের মতো নয়। বাংলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ তিনি লিখিয়েছিলেন নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে দিয়ে। এ বইটি তিনি নিজে আদ্যোপান্ত সম্পাদনাও করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি পরে আর পাওয়া যায়নি (নির্মল ২০০০ : ২৯৮; রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/২ : ৩৫)। ফলে ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও পদ্ধতির হদিশ সরাসরি জানার সুযোগ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোন পথে হওয়া দরকার, অন্তত এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা করতেন, তার বিশদ পরিচয় আছে পূর্বোক্ত গ্রন্থে; আর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *বাংলাভাষা-পরিচয়ে*। একে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন 'চলতি' বাংলার প্রথম ব্যাকরণ হিসাবে : 'চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। ... এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩ : ৫৯৬)। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এটি এ ধরনের শেষ চেষ্টাও বটে।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রচনার চেষ্টা পরে আর দেখা না গেলেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা — বিশেষত খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার আকাঙ্ক্ষা — বহু বৈয়াকরণকে প্রভাবিত করেছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে। ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথসহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত অন্য বৈয়াকরণদের স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫ : ১৪৮)। সংস্কৃত উপাদানের ক্ষেত্রেও তিনি খানিকটা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন। ইৎ-সহ প্রত্যয় নির্দেশের যে রেওয়াজ পূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায়, তিনি তা বাদ দিয়ে 'ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে' কেবল তা-ই উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর ব্যাকরণে খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্ ইত্যাদি সমস্ত প্রত্যয়ই 'অ' প্রত্যয় হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তও এর অনুকূল : 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫ : ১৪৮)। উল্লেখ্য, বাংলা প্রত্যয়গুলোর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ তিনি নিয়েছেন প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ থেকে। বস্তুত, 'বাংলা ব্যাকরণ যে একটি পৃথক ব্যাকরণ এই বোধের পরিচয় গ্রন্থটির প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়' (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/২ : ২৯)। তা সত্ত্বেও এই ব্যাকরণে নতুন বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের কোনো সাফল্য দেখা যায় না। তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণকে এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদেরই অনুসরণ করেছেন'। (হুমায়ুন ১৯৮৮ : ১২২)

মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাকরণেও 'নতুন বাংলা ব্যাকরণ' রচনার দাবি আছে। 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে তিনি লিখেছেন :

> বহুদিন হইতে একখানা খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ লেখার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে তাহা এতদিন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এখনও যে সম্ভবপর হইয়াছে, তেমন নহে; তবে তাহার সূত্রপাত হইল। এই ব্যাকরণখানির অন্য-কিছু না দেখিয়া শুধু সূচিপত্রটুকু দেখিলেই, উক্তিটির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই ব্যাকরণটিকে বাজারে প্রচলিত যে কোনো বাংলা-ব্যাকরণ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক ও নূতন বলিয়া মনে হইবে। ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠ্যতালিকার মধ্যে থাকিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বগ্রাসী কবল হইতে বাংলা ব্যাকরণের মুক্তির যথাসাধ্য চেষ্টা এই পার্থক্য ও নূতনত্বের জন্য একমাত্র দায়ী। ... মোটের উপর ইহার দুই-তৃতীয়াংশ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। ইহাই এই ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্য। (মুহম্মদ এনামুল ১৯৯৩ : ৩০৩)

সন্ধির ক্ষেত্রে এবং প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলা অংশ আর সংস্কৃত অংশ আলাদা করা এবং বাংলা অংশ যথাসম্ভব বিস্তারিত করে লেখা থেকে মনে হয় এনামুল হক 'বাংলা ব্যাকরণ' সম্পর্কে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। অন্তত তিনটি পরিচ্ছেদ — বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, দ্বিরুক্তি ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ — রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণচর্চার কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এ পর্যন্তই। 'প্রাকৃত বাংলা'র কোনো অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের চেষ্টা এই ব্যাকরণে দেখা যায় না। বরং ব্যাকরণিক বিভিন্ন উদাহরণে পাওয়া যায় পুরোনো ব্যাকরণের একরাশ শব্দ ও প্রয়োগ, যেগুলো বাংলার সঙ্গে মোটেই সম্পর্কিত নয়। সন্ধি, প্রত্যয় ও সমাসের ক্ষেত্রে এরকম উদাহরণ বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ-কথিত তৎসম ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণ — এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের একটা দুর্বল চেষ্টা এ ব্যাকরণে এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ব্যাকরণে লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ থেকে বেরিয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার কোনো ব্যাপক চেষ্টা বিশ শতকে দেখা যায়নি।[৭] বাংলা একাডেমীর *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থের মুখবন্ধে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে : 'সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ এবং তাঁদের অনুসারী বিদগ্ধজনের একটি রক্ষণশীল অংশ সংস্কৃতানুসারিতা থেকে মুক্ত হতে না পারায় কথ্য বা প্রমিত চলিত বাংলা ভাষার একটি আদর্শ ব্যাকরণ-গ্রন্থ গোটা বিশ শতকেও তৈরি করা সম্ভব হয়নি' (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১ : সাত)। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থের সম্পাদকীয় দাবি : 'প্রমিত বাংলা ভাষার এই ব্যাকরণ বাঙালির শতাধিক বৎসরের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন'। তাঁদের এ দাবির পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ এ ব্যাকরণে পাওয়া যায়। পুরোনো বাংলা ব্যাকরণের কাঠামো এতে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'ধ্বনিবিজ্ঞান' আর দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'প্রমিত বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব' এবং এই দুই পর্বের উপশিরোনামগুলো দেখলে বোঝা যায়, প্রধানত পশ্চিমা ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি অনুযায়ী শতাধিক বছর ধরে বাংলা ভাষার যেসব ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হয়েছে, সেগুলোই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে — সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব ও তদনুযায়ী বিশ্লেষিত বাংলা বর্ণপরিচয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটেছে তৃতীয় পর্বের 'প্রমিত বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব' অংশে। পুরোনো ব্যাকরণগ্রন্থগুলোতে, প্রধানত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে, খুব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হত বাংলা ভাষার শব্দস্তর, যদিও বাংলা শব্দের বিশিষ্টতাগুলো তাতে ঠাঁই পেত না। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে*ও বাংলা রূপতত্ত্বের বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু তাতে সমাস-উপসর্গ-সন্ধি-প্রত্যয় পুরোনো রূপে

হাজির হয়নি; এগুলোর প্রাধান্যও রক্ষিত হয়নি। চতুর্থ পর্বে আলোচিত হয়েছে 'প্রমিত বাংলা ভাষার বাক্যতত্ত্ব', আর পঞ্চম পর্বে 'প্রমিত বাংলা ভাষার বাগর্থতত্ত্ব ও ব্যঞ্জনাতত্ত্ব'। পুরোনো ব্যাকরণগুলোতে এ দুটির খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেত। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অবলম্বিত হয়েছে মূলত আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতি।

রবীন্দ্রনাথসহ 'নবব্যাকরণবিদ'দের কয়েকটি আকাঙ্ক্ষা এ ব্যাকরণেই প্রথমবারের মতো পরীক্ষিত হয়েছে। একটি হল, বাংলা ভাষা ব্যাখ্যার জন্য অন্য ব্যাকরণ, বিশেষত সংস্কৃত ব্যাকরণকে, ভিত্তি না করা। বাংলা ব্যাকরণের নিজস্ব কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক পশ্চিমা ভাষাবিজ্ঞান এতে ব্যবহৃত হয়েছে সহায়ক ভূমিকায়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার কথ্য মানরূপই এতে বিশ্লেষিত হয়েছে — অচলিত ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যরূপের দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কিছু নতুন — অন্তত পুরোনো ব্যাকরণগুলোর সাপেক্ষে — পরিভাষা। পুরোনো পরিভাষাগুলোও সংজ্ঞার্থের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। একই কারণে বদলে গেছে গৌণ-মুখ্যের ভেদ। যেমন, 'কারক ও বিভক্তি' এবং 'সমাস' এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেয়েছে। পারিভাষিক শব্দের এই পরিবর্তনের একটা ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় 'শব্দভান্ডার' অধ্যায়ে। এখানে বহুপ্রচলিত 'তৎসম' শব্দটি পরিহার করা হয়েছে দুই কারণে (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১ : ৩২০) : এক. শব্দগুলো বানানরূপে মোটামুটি সংস্কৃতের মতো হলেও উচ্চারণ-রূপে নয়; দুই. সংস্কৃত থেকে আসা এ ধরনের শব্দকে 'তৎসম' বললে অন্য ভাষার শব্দকেও একই যুক্তিতে তৎসম বলতে হয়। এ অবস্থান সর্বত্রই রক্ষিত হয়েছে।

অন্যদিকে, 'সম্পাদকীয় ভূমিকা'য় যেমনটা বলা হয়েছে, 'প্রথম প্রয়াসে'র নানা দ্বিধা আর অপূর্ণতাও ব্যাকরণটিতে দৃষ্টিগোচর হয়। এ দ্বিধার বড় দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় খণ্ড। এ খণ্ডে তত্ত্বাকারে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রথম খণ্ডের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোতে সংযোজিত হতে পারত। হয়নি যে তার কারণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারা। এ সমস্যাটা বাহ্যিক এবং পরের সংস্করণগুলোতে তার সমাধান সম্ভব।[৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাকরণচিন্তার সারসত্য অবলম্বনে এ ব্যাকরণের আরো দুটি তত্ত্বীয় সংকট চিহ্নিত করা যায়, যেগুলো সহজে সমাধানযোগ্য নয় : এক. কথ্য ও লেখ্য 'মানবাংলা'কে আলাদা করা; দুই. বাংলা ভাষার 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ব্যাকরণ কল্পনা করা। প্রথমটি সম্পর্কে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ কথ্য ভাষার ভিত্তিতেই তাঁর যাবতীয় আলোচনা করেছেন; কিন্তু লেখ্য-বাংলার ব্যাকরণ আলাদা হওয়া দরকার — এমন কোনো ধারণা তাঁর বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় না। শুধু লেখ্য-বাংলা নয়, সাহিত্যিক বাংলাকেও তিনি যথাসম্ভব কথ্যের অনুগামী দেখতে চেয়েছেন। তাই অন্তত 'মান বাংলা'র ক্ষেত্রে পৃথক ব্যাকরণের প্রশ্ন আসেনি।

বাংলা ভাষার 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ব্যাকরণের কথা প্রথম বিস্তারিত বলেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

প্রস্তাবে এ ধরনের দুই-ধারা ব্যাকরণের কোনো কথা ছিল না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'সংস্কৃতপন্থী' ও 'বাংলাপন্থী' দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে। তাই তাঁকে সংস্কৃতপন্থীদের এই নিশ্চয়তা দিতে হয়েছিল যে, বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাদির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের নিয়ম অক্ষুণ্ন থাকবে। সে নিয়ম বাঙালিদের তৈরি করার দরকার নেই। কারণ, সংস্কৃত ব্যাকরণেই তা লভ্য। কিন্তু 'খাঁটি বাংলা' অংশের ব্যাকরণ এখনো রচিত হয়নি। এখন সে অংশের ব্যাকরণ তৈরি করাই আশু কর্তব্য। তাঁর ভাষায় :

> এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। ... সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না। পাণিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন; ... বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। (রামেন্দ্র ১৩৫৬ : ১২২-২৩)

'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়লে এবং পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, প্রতাপশালী সংস্কৃতপন্থীদের কাছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার দাবি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও সত্য, তিনি চাইতেন, বাংলা ভাষার সংস্কৃত অংশের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় ও ব্যবহার সংস্কৃত বিধি অনুযায়ী হোক। ফলে বাংলা ব্যাকরণের দুই আলাদা অংশ তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোতেই স্বীকৃত। বাংলা ভাষাপ্রশ্নে সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে জীবনভর রবীন্দ্রনাথকেও লড়তে হয়েছিল। তিনিও অনেকবার এই সরল সমাধানের কথা বলেছেন। সংস্কৃত থেকে ধার করা অংশ অনাহত রেখে খাঁটি বাংলা অংশের ব্যাকরণ লেখার কথা তাঁর লেখায় বারবার পাওয়া যায়। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : 'বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা বৈয়াকরণের সে-যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১১৭)। জগৎমোহন সেনকে এক পত্রে লিখেছেন : 'বাংলার যে অংশটা সংস্কৃতের অনুবর্তী, যেমন সন্ধি তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস, সেইগুলোই গোড়া থেকে জানা চাই। বাংলায় তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার কিছুপরিমাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে সম্ভবপর হয়' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২৫৫)। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের ব্যাকরণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত প্রকাশিত হয়েছে এভাবে : 'শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১২৩)

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু উদ্ধৃত মন্তব্যগুলো থেকে বাংলা ব্যাকরণের বাংলা ও সংস্কৃত অংশের আলাদা নিয়মের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। একই সঙ্গে কোন পরিস্থিতিতে

কী কারণে তিনি এসব কথা বলেছেন, তারও ইঙ্গিত মেলে।[৯] বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণকে বাংলা ব্যাকরণ হিসাবে চালানোর বাস্তবতায় এ প্রস্তাবে যে আপসরফার সূত্র পাওয়া যায়, পরবর্তী বৈয়াকরণেরা তাতে সায় দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাকরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যোতিভূষণ চাকীর ব্যাকরণে এ পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। যদিও এ চারটি ব্যাকরণেই কথিত 'বাংলা অংশ' পরিমাণে খুব সামান্য, আর কাঠামো ও তত্ত্বায়নের দিক থেকে পুরোপুরি উপেক্ষিত। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* এই দুই সমস্যার একটা সুরাহা হয়েছে। কিন্তু এখানেও 'সংস্কৃত অংশ' আলাদা রাখার প্রস্তাব থেকে গেছে। 'রূপতত্ত্বের ভূমিকা' অংশে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন :

> সংস্কৃত শব্দের নির্মাণ সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশ, যেমন অন্য ভাষার শব্দের নির্মাণ সেই সেই ভাষার ব্যাকরণের অংশ। স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের একটা লক্ষ্য থাকে লিখিত ভাষা, বিশেষত তার বানান-পদ্ধতি শেখানো, ফলে তাতে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি-সমাস প্রকরণের বিস্তারিত পাঠ থাকে। এই ব্যাকরণের লক্ষ্য প্রমিত বাংলার ব্যাকরণ, ফলে এ ব্যাকরণে বাংলা শব্দনির্মাণই বিশেষভাবে অনুধাবন করা হবে, সংস্কৃত বা অন্যান্য ভাষার শব্দনির্মাণ নয়। সে সব ভাষার শব্দনির্মাণের জন্য প্রথাগত নানা ব্যাকরণ দেখা যেতে পারে, যেমন সংস্কৃত শব্দনির্মাণ প্রণালী দেখার জন্য পরিচিত নানা সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাড়াও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৯৩৯ : ১২০-২৩৬)-এর পাঠ দেখা যেতে পারে। (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১/১ : ১৬০)

এ সিদ্ধান্তে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামতের প্রতিফলন আছে। কিন্তু পদ্ধতিটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার জন্য যথেষ্ট অনুকূল নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় উদ্ধৃত মন্তব্যেই — বাংলা ভাষার একটি অংশের বিশ্লেষণ দেখার জন্য অন্য ব্যাকরণের বরাত দিতে হয়েছে। ওই অংশের শব্দ হিসাবে উল্লেখিত 'ব্যাকরণ', 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়', 'ঐশ্বরিক', 'পর্বতসানুদেশ', 'পাণ্ডব' ও 'গ্রামান্তর' প্রভৃতি কথ্য মানবাংলায় নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই এ ধরনের শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ব্যাকরণসূত্র প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের বাইরে থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষা-বিষয়ক রচনায় এমন বহু মন্তব্য-বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, যা এ ধরনের দ্বি-কক্ষ ব্যাকরণের বিরোধী। অন্তত ভবিষ্যতে দ্বি-ধারা ব্যাকরণ এক ধারায় উপনীত হবে — এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

এ সমস্যার মূলে আছে উনিশ শতকের ভাষাদর্শ, যেখানে বাংলার সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত উপাদানগুলোকে আলাদা মূল্য দেওয়া হয়েছে। এ রীতি অনুযায়ী ইংরেজি ব্যাকরণে 'ফরাসি অংশ' এবং 'লাতিন অংশ' থাকার কথা। কিন্তু এ ধরনের বিভাজন প্রচলিত ইংরেজি ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায় না। ফরাসি ও লাতিন উৎসের শব্দগুলোর কিছু ব্যাকরণিক ও বানানগত বৈশিষ্ট্যসহ রচিত হয় ইংরেজি ব্যাকরণ। বাংলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে : 'যে সংস্কৃত শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে — এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে' (রবীন্দ্রনাথ

১৪০২ : ১১৪)। বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে 'সহজ কথাটা' শক্তই থেকে গেছে মূলত বানানরূপের কারণে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ বারবার বানানরূপ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। দেবপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত প্রথম পত্রে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবলমাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন — কিন্তু রসনা নির্জীব নয় — অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কারমতই উচ্চারণ করে চলে। সেদিকে লক্ষ করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২৭৫)

এ ধরনের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথে বিস্ময়করভাবে বিপুল।[১০] তাতে বোঝা যায়, সংস্কৃতপন্থীদের বিরোধ এড়ানোর জন্য 'সংস্কৃত' অংশের জন্য সংস্কৃত নিয়মের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু আদতে তিনি বাংলা ভাষায় 'খাঁটি' সংস্কৃতের উপস্থিতি বিষয়েই সন্দিহান ছিলেন। এ সন্দেহ ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। শব্দঋণের প্রাথমিক সূত্র এই যে, ঋণী ভাষার ধ্বনি-রূপতাত্ত্বিক সূত্র মেনেই অন্য ভাষার কোনো উপাদান ভাষায় প্রবেশাধিকার পায়। ঔপনিবেশিক ভাষাদর্শে সংস্কৃতের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল বলেই সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ প্রাথমিক সূত্রের প্রতি নজর পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর ভাষাচর্চায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয় ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে সতর্কতার পরিচয় মেলে :

> এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা রয়ে যায়। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩ : ৬৩৬)

এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণ রচনার একটি ঐতিহাসিক সংকটের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন — প্রথমে বানানরূপে সংস্কৃতের অনুসরণ, পরে সেই বানানরূপের বরাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের আমদানি। এ সংকট মোচনের জন্যই তিনি বানানরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে বারবার সতর্ক করেছেন।

যে সকল শব্দ অন্য ভাষার নিয়মে সাধিত হয়ে পরে বাংলায় এসেছে, বাংলা ব্যাকরণে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তির উপায় ও ধরন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যায়। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে বাংলা প্রত্যয় শনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন হয় না। ... বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ... হিন্দি পার্সি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেও আমার ওই একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পার্সি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ... অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনো প্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৯০-৯১)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে ব্যুৎপন্ন পূর্বোক্ত শব্দগুলোর মধ্যে 'ঐশ্বরিক', 'গ্রামান্তর' প্রভৃতি শব্দ এ সূত্রানুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায়। 'ইক' প্রত্যয়যোগে বহু বাংলা শব্দের বিশেষণরূপ নির্মিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে মূল শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে এই নিয়মকে বাংলা ব্যাকরণের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। সংস্কৃত সূত্রের বরাত ছাড়াই তা সম্ভব। 'গ্রামান্তর' শব্দের 'অন্তর' অংশ ব্যবহৃত হয় বহু প্রচলিত বাংলা শব্দে। তাই সমাসেই হোক বা সাদৃশ্যসূত্রেই হোক, এ ধরনের শব্দের গড়ন বাংলা ব্যাকরণেরই আলোচ্য। 'ব্যাকরণ' বা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে'র মতো যে সকল শব্দের গড়ন কেবল সেই শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য বাংলা শব্দ বা সমরূপ নতুন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না, সেগুলো বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সেগুলোর জন্য মূলভাষার ব্যাকরণ দেখতে হবে, অন্য কোনো বাংলা ব্যাকরণ নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে এই মতই দিয়েছিলেন (হরপ্রসাদ ২০০০/বি : ৫৯৮)। ইংরেজি ভাষায় এ রীতি বিপুলভাবে অনুসৃত হয়। এ ভাষায় প্রচুর জ্ঞানজাগতিক শব্দ গৃহীত হয়েছে গ্রিক ও লাতিন থেকে। সেসব শব্দের ব্যাকরণ ইংরেজি ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গ্রিক-লাতিনের বরাতেই এ ধরনের শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়ে থাকে।

কথিত 'তৎসম' শব্দগুলোর অর্থ ও ব্যবহার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ চলতি ব্যবহারকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।[১১] 'প্রদোষ' শব্দের ব্যবহার নিয়ে তাঁর যুক্তিতর্ক ও সিদ্ধান্ত এর ভালো উদাহরণ। *প্রবাসী* পত্রিকার 'পারস্য যাত্রা' নিবন্ধে 'রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষ' বোঝাতে 'প্রদোষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। তাতে সংস্কৃত অর্থ রক্ষিত না হওয়ায় তাঁর নিন্দা হয়। এ প্রসঙ্গে সুশীলচন্দ্র মিত্রকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন :

> প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলা ভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এই রকম স্থির করেচি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সংগম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চলবে না। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২০৩)

পরে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে তিনি শব্দটির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন : 'দোষ শব্দের অর্থ রাত্রি — প্র উপসর্গটা সামনের দিকে তর্জনী তোলে — অতএব ওই শব্দটাকে বিশ্লেষণ করে দুই অর্থই পাওয়া যেতে পারে — অর্থাৎ যে সময়টার সম্মুখে রাত্রি, অথবা রাত্রির সম্মুখে যে সময়। রাত্রির প্রবণতা যে দিকে'। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২০৫)

বাংলা ভাষার রূপ, শুদ্ধতা ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাবীন্দ্রিক-পদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত 'গা'ব' শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগরূপে দেখিয়েছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বিজনবাবুর সঙ্গে আলাপ করলে তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের একটি নিয়মের উল্লেখ করে বললেন, 'বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু 'গাহ্' — যে ইকার এই হ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত, তার বৈধব্য ঘটলেও বিনাশ হয় না, হ লোপ হলেও ই টিঁকে থাকে'। রবীন্দ্রনাথ পরে আলাপ করেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর এবং পণ্ডিত হরিচরণের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে এই প্রয়োগ কটু ঠেকছে না, বরং তাঁরাও এরকম ব্যবহার করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাকে চিন্তা করতে হল। শব্দের ব্যবহারটা কী, আগে স্থির হলে তবে তার নিয়ম পরে স্থির হতে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলার যে ভূভাগের ভাষা প্রাকৃত বাংলা বলে আজকালকার সাহিত্যে চলেছে সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২৪৮)। অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২: ২৪৮-৪৯)। প্রথমে হ ধ্বনিযুক্ত ক্রিয়াপদের তালিকা তৈরি করেছেন — কহ্, গাহ্, চাহ্, নাহ্, সহ্, বহ্, বাহ্, রহ্, দোহ্। দেখা যায় অধিকাংশ স্থলে এই-সকল ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কারকে বিকল্পে ই থাকে এবং লোপ পায়। 'কথা কইবে'ও হয় 'কথা ক'বে'ও হয়। ভিক্ষে চা'ব না বললেও হয়, ভিক্ষে চাইব না বললেও হয়। কেবল বহা ও বাহা ক্রিয়াপদে 'ব'বে' 'বা'বে' ব্যবহার শোনা যায় না। তার কারণ পাশাপাশি দুটো 'ব'-কে ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের এসব মত, সিদ্ধান্ত, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিকভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর কাঙ্ক্ষিত ব্যাকরণে কথ্য-লেখ্যের ফারাক নেই, 'বাংলা অংশ' ও 'সংস্কৃত অংশে'র আলাদা ভাগও নেই। বরং বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনই তাঁর মূল উদ্দিষ্ট।

আবার মান বাংলার মতো ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক[১২] আর সমন্বয়ধর্মী প্রস্তাব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের রচনায়। *আত্মশক্তি* গ্রন্থের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে তিনি এই 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ' রচনার প্রস্তাব দিয়েছেন :

> বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২ : ৭০৬)[১৩]

আগের বছর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধেও তিনি একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে। ... ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১২৩)[১৪]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যাকরণ রচনার যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন তা তাঁর সামগ্রিক ভাষাচিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এ ব্যাকরণ আরোহী, গণতান্ত্রিক ও স্বনির্ভর। তা গড়ে উঠবে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে; উপাত্ত সংকলিত হবে সব উপভাষা থেকে; আর বিশ্লেষিত হবে আরোপিত কোনো ছাঁচে নয়, বরং আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্যের তুলনাসূত্রে। এভাবেই কেবল মানভাষা আর মানভাষার ব্যাকরণ পুরো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাষার পাঠ অন্য দশ উপাদান থেকে আলাদা নয়। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো ভাষার সঙ্গে মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> Language as communication and as culture are ... products of each other. Communication creates culture : culture is a means of communication. Language carries culture, and culture carries, particularly through orature and literature, the entire body of values by which we come to perceive ourselves and our place in the world. How people perceive themselves affects how they look at their culture, at their politics and at the social production of wealth, at their entire relationship to nature and to other beings. Language is thus inseparable from ourselves as a community of human beings with a specific form and character, a specific history, a specific relationship to the world. (Thiong'o 2007 : 15-16)

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে এ ধরনের সামগ্রিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। ওই 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধেই তিনি ভাষারহস্যকে স্থান ও কালের বিপুল বিস্তৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন : 'আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/২ : ৭০৫)। এ বক্তৃতাটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুষ্ঠানে। তিনি চেয়েছেন এই পরিষদের কাজে ছাত্রদের সম্পৃক্ত করতে। সে কাজ শুধু ব্যাকরণ তৈরির কাজ নয়। দেশের সার্বিক পরিচয় তৈরির কাজ। ব্যাকরণ রচনার বিখ্যাত প্রস্তাব সেই কাজের অংশ মাত্র। সে

ব্যাকরণ তৈরির মূলপ্রেরণা কিন্তু ভাষার পাঠ নয়, বরং দেশের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বড় অর্থে এক কেজো দিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন। শুধু ব্যাকরণ রচনার আরোহী প্রস্তাবে সে কাজের শেষ নয়; পুরো ব্যাপারটাকে তিনি সম্পর্কিত করে দিয়েছেন বৃহত্তর জাতীয় দরকারের সঙ্গে।

এ দরকার কখনো ফুরাবার নয়। জনগোষ্ঠীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বদলে যায় ভাষার গড়ন। বদলে যায় উপাদান ও ব্যবহারবিধি। তাই ব্যাকরণ রচনার কাজও একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণ ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমি' তৈরী করে মাত্র' (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৬ : ৫১৩)। পুরোনো ব্যাকরণ তাই সুদীর্ঘকাল প্রাসঙ্গিক না-ও থাকতে পারে; কিন্তু তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি প্রাসঙ্গিক থেকে যায়।

৬

উনিশ শতকের শেষ দশক আর বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলা ভাষাচর্চায় যে বর্ণনামূলক ধারা সূচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখালেখিতে তার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনা পরিমাণে বিপুল, গভীরতায়ও অতুলনীয়। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের উপনিবেশায়নের ব্যাপারে — শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো — রবীন্দ্রনাথও আগাগোড়া হুঁশিয়ার ছিলেন। ওই দুজনের মতো তিনিও সমস্ত প্রস্তাব বা বিশ্লেষণ করেছিলেন ভাষার ব্যবহার-উপযোগিতার কথা বিবেচনার কেন্দ্রে রেখে। তাঁর বিশ্লেষণের প্রশংসা করেছেন পরবর্তী গবেষকরা, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় না। বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব যে বাস্তবায়িত হয়নি, সে ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই বললেই চলে।

বাংলা একাডেমীর *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* সংস্কৃতায়িত প্রচলিত ব্যাকরণের ছাঁচ মানা হয়নি। কিন্তু বাংলা ভাষার 'সংস্কৃত' ও 'প্রাকৃত' অংশকে আলাদা কোটায় রেখে দেওয়ায় 'মান-বাংলার' স্বাধীন-সার্বভৌম ব্যাকরণের দাবি এ ব্যাকরণেও পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া 'প্রমিত' বাংলার সংকীর্ণতাও রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত 'বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণে'র বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিষয়ক রচনার সমন্বিত পাঠেই এসব সংকট নিরসনের দিশা আছে।

টীকা

১. ধ্রুপদী ভাষার অনুকরণে চালু ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন সমকালীন ইউরোপের স্বাভাবিক চর্চা। নব্য-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ব্যাকরণচর্চায় লাতিনের প্রভাব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অন্যদিকে, ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা জ্ঞানচর্চার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে বিবেচিত হত। ফলে বাংলা সংস্কৃতের কন্যা হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার পর সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞানগত বাধা আর ছিল না। তবে হ্যালহেডের নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন উইলিয়াম জোন্সের ফারসি ব্যাকরণ দ্বারা। জোন্স যেমন ফারসি ব্যাকরণে আরবির ছক ব্যবহার করেছিলেন, হ্যালহেড তেমনি বাংলা ব্যাকরণে যথাসম্ভব সংস্কৃতের উদাহরণ

টেনেছেন। আবদুল কাইউমের হিসাবে হ্যালহেডের ব্যাকরণে অন্তত ৬৫ বার সংস্কৃতের প্রসঙ্গ এসেছে (Qayyum 1982 : 88)।

২. 'সভ্যকরণ' প্রকল্পের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটি সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে সবসময়েই যুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বরাবরই উঁচু 'সভ্যতা'র প্রচারক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আর 'Part of 'civilization' was, needless to say, language.' (Philipson 2003 : 45)

৩. আবদুল কাইউমের বর্ণনা থেকে মনে হয়, হ্যালহেড পশ্চিমবঙ্গীয় পণ্ডিতের প্রভাবেই সংস্কৃতায়নের পথ ধরেছিলেন। তিনি উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে একে ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু কোনো একজন বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির প্রভাব দিয়ে সংস্কৃতায়নের মতো গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কুলকিনারা করা যাবে না। একে ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বিশেষ পর্বের বাস্তবতা হিসাবেই দেখতে হবে।

৪. পুরোনো ভাষার নজির হিসাবে আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। নির্মল দাশ (২০০০ : ৩৪) লিখেছেন, 'তাঁর ব্যবহৃত উচ্চারণপদ্ধতি, পদসাধনের সূত্র ও দৃষ্টান্তে নব্যবাংলার পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ রক্ষিত হয়েছে, উনিশ শতকের সংস্কৃতপন্থী লেখকদের পরিমার্জিত গদ্যচর্চার পূর্বে বাংলা ভাষার যে রূপ ও স্বরূপ বিদ্যমান ছিল মনোএলের ব্যাকরণে মোটামুটি তারই চরিত্র আভাসিত হয়েছে'। পরের গদ্যের সঙ্গে আগের গদ্যের সার্বিক বিচ্ছেদ মানোএলের উদাহরণগুলোর গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

৫. বিদেশি বৈয়াকরণদের তুলনায় দেশি পণ্ডিতদের ব্যাকরণগুলোতে সংস্কৃতায়নের হার সাধারণভাবে অনেক বেশি ছিল। যেমন কেরির ব্যাকরণে সংস্কৃতের অনুসরণ সত্ত্বেও দেশজ ও বিদেশি উপাদান পুরোপুরি বাদ পড়েনি। কিন্তু 'বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণগুলিতে বহুদিন পর্যন্ত সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব বজায় ছিল' (নির্মল ২০০০ : ১৫৫)। দেশীয়দের সংস্কৃতপ্রীতি আর 'যাবনীমিশাল' চলতি বাংলায় বিদ্বেষের কারণ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, সবক্ষেত্রেই সংস্কৃতায়নের পক্ষে বরাত দেওয়া হয়েছে সেই তত্ত্বের, যা প্রাচ্যবাদীচর্চা আর সাহেব-পণ্ডিত যৌথতায় আগেই নির্মিত হয়েছিল। *বঙ্গদূত* থেকে *সমাচার দর্পণে* ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ তারিখে মুদ্রিত এক নিবন্ধে যেমন বলা হয়েছে :

'বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। ... যদ্যপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯ : ৫০)

একই পত্রিকায় *বঙ্গদূত* থেকে ৬ মার্চ ১৮৩০-এ ছাপানো আরেক লেখায় বলা হয়েছে :

'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ মাগধী শকা আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔদ্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈচাশী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকারপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। ... বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৯ : ৫১)

এই দুই দাবি হ্যালহেড-কেরি-ফরস্টারের দাবির পুনরুক্তি মাত্র। উনিশ শতকের প্রায় সকল ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণের ভূমিকায় এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

৬. রামমোহনের ব্যাকরণের নানা সীমাবদ্ধতা ছিল (নির্মল ২০০০ : ১৭৩)। শ্যামাচরণ সরকারের অভিযোগ, বইটি বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের শুদ্ধতার জ্ঞান দেয় না, প্রচলিত উপভাষার

বাগবিধি সম্পর্কেও বিশেষ সাহায্য করে না। উইলিয়াম অ্যাডাম বলেছেন, বইটি ত্রুটিপূর্ণ ও অগোছালো। এসব সমালোচনা অসত্য নয়। কিন্তু এগুলো বইটির পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ার মূল কারণও নয়। তা হলে সংক্ষেপিত সংস্করণে ঝেড়েবেছে নেওয়া যেত। সেকালের প্রতাপশালী ব্যাকরণগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চালু প্রভাবশালী ধ্যানধারণার বাইরে অবস্থান নেওয়াই এই বিস্মৃতির মূল কারণ।

৭. বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসকার নির্মল দাশ নতুন ধরনের কয়েকটি কাজের উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

'বাংলা ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে ইদানীং কালে তেমন কোনো অভূতপূর্ব বা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেনি, — একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে বাংলা ভাষার স্বরূপ উদঘাটন ও পরিচায়নের ব্যাপারে সক্রিয় ও প্রয়োজনভিত্তিক চিন্তাভাবনার কাজও ইদানীংকালে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এইসব কাজ ঘটেছে ও ঘটছে স্কুল-ব্যাকরণের সীমানার বাইরে, অন্যদিকে এইসব কাজ দেখা দিচ্ছে নিভৃত একক চিন্তা বা সভাসমিতির নিতান্ত তাত্ত্বিক বাদানুবাদের পরিণাম হিসেবে নয়। এইসব কাজ উঠে আসছে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব ও প্রায়োগিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে যৌথ চিন্তার ভিত্তিতে। এই ধরনের প্রয়োজনভিত্তিক কাজের মধ্যে তিনটি উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের নেতৃত্বে জাপানের তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাধিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রকল্প 'গীতাঞ্জলি : সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাষাভিত্তিক বিশ্লেষণ'। এই বিশ্লেষণে কম্পিউটার-প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। বিশ্লেষণের সময় সম্পাদকমণ্ডলি ও গবেষণা-সহায়করা লক্ষ করেছেন বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রচলিত কাঠামো বিজ্ঞানসম্মত নয়, কাজেই সম্পাদকমণ্ডলী প্রচলিত ব্যাকরণ-কাঠামোকে ভেঙে বিশ্লেষণের নতুন ব্যাকরণগত ছক তৈরি করে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কাজ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিদ্যার্থী অভিধান প্রকল্প। এখানেও যৌক্তিকতার স্বার্থে সম্পাদকেরা অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েছেন প্রচলিত ব্যাকরণকাঠামোকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে। তৃতীয় কাজটি হল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের বিভিন্ন শাখায় দৈনন্দিন বাংলা ব্যবহারের মধ্যে একটা যুক্তিভিত্তিক সামঞ্জস্য আনার উদ্যোগ। বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে *আনন্দবাজার পত্রিকা* এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নেয় এবং সেই উপলক্ষে *বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন* প্রকাশিত হয়। ... এইসব প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্ম সবই ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে। প্রতিষ্ঠান-আশ্রিত এইসব যৌথ চিন্তা ও পরামর্শ যে সমস্তই নিশ্ছিদ্র ও ত্রুটিহীন – ঘটনা এমন নয়। তবু এইসব প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ বাংলা ভাষাচর্চার হাজার বছর পর বাংলা ভাষার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য নূতনতর ব্যাকরণকাঠামোর কথা ভাবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।' (নির্মল ২০০০ : (৭)-(৮))

৮. এই ব্যাকরণের প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গে বিস্তর কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে। এর কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। অন্য ধাতুর ব্যাকরণে অভ্যস্ত পাঠক আর ভিন্ন মতাবলম্বী বৈয়াকরণদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ক্রমশ মূলনীতি হিসাবে এ ব্যাকরণের নতুন প্রস্তাবগুলো গ্রাহ্যতা পেলে এ অংশগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব।

৯. 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ প্রতিফলন পাওয়া যায়। এখানে তিনটি অংশ উদ্ধৃত হল :

এক. 'বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান, এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা-নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, 'পাগলাম' এবং 'সাহেবিয়ানা' কথা যে বাংলায় আছে, ও 'আম' এবং 'আনা' নামক সংস্কৃতেতর প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায় — এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন 'উন্মত্ততা' ও 'ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব' কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটির অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

'বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১০৬)

দুই. 'ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ওই কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিসটা অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে 'শ্রাবি' হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর 'শু' 'শৌ' হইয়া ও পরে ইকার যোগে 'শৌনিতেছে' হইত। হয়ত খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃতে পঠ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্ ধাতু হইতে 'পড়ান' হয়, 'পাড়ন' হয় না। অতএব যেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্ সিগ্‌নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর-একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়ত তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে; কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১১৫)

তিন. 'খাঁটি বাংলা কথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা; ... দাগ শব্দের উত্তর কোনো মতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। ... সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলা কথার সে-স্বাধীনতা নাই — 'কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে' এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু 'কথাটা ঠিক হইয়াছে' না বলিয়া যদি 'ঠিকা হইয়াছে' বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলা রচনায় সংস্কৃত শব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলা শব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ — সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ১১৬-১৭)

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কেবল তথাকথিত 'বাংলা অংশে'র ন্যায্য হিস্যা দাবি করেননি; বরং ওই অংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কথিত 'সংস্কৃত অংশে', তাঁর মতে, বাংলার নিয়ম চলতেও পারে; কিন্তু 'বাংলা অংশে' সংস্কৃতের নিয়ম চলার কোনো উপায় নেই।

১০. বাংলা ভাষার 'তৎসম' উপাদানের তৎসমত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও সে স্বীকৃতি বাংলা ব্যাকরণের প্রগতির পক্ষে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। এখানে এরকম দুটি মত-মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল :

এক. 'প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকারদের অনুসরণ করিয়া বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-আকৃতিবিশিষ্ট শব্দকে তৎসম নামে অভিহিত করিতেছেন। ... প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ 'সম' বলিয়াছেন কোন্ অর্থে? রূপের দিক দিয়া সমান? না, ধ্বনির দিক দিয়া সমান? বাংলায় সংস্কৃতের রূপটাকেই গণনা করা হয়। প্রাকৃতে কি হইত? শুধু রূপ বা শুধু ধ্বনি অথবা রূপ এবং ধ্বনি উভয়েরই সমতা বিচার করা হইত? আমাদের মনে হয় কেবল ধ্বনিটাকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। রূপ তাঁহাদের গণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হইলে বলিতে হইবে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলির তৎসম নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারা আর যাহাই হউক তৎসম নয়।' (বিজন ১৯৭৭: ৯৫)

উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে লেখক এ মতের পক্ষে বিস্তর সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়েছেন।

দুই. 'তৎসম শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। 'বণিক্' 'দিক্' হসন্ত হারাইল, তাহাদের তৎসমত্ব বজায় রহিল কি? 'বস্তুতঃ' বিসর্গ হারাইল, তাহা তৎসম রহিল কি? ... 'সুরিয়' যখন সূর্য হইল, 'নক্ষত্র'

যখন 'নক্‌খত্র' হইল তখন তো তাহা খাঁটি বাংলাই হইয়া গেল, উহাদের তৎসমত্ব বজায় রহিল কি? ... যাহাকে একান্তভাবে বাংলার শব্দ বলিয়াই জানিতাম বাচস্পতি মনিয়র উইলিয়াম সাহেব তাহাদের তৎসম বলিয়া শনাক্ত করিয়াছেন। যেমন, ভগিনী হইতে ভগ্নী আসিয়াছে। বাংলার স্বভাবধর্ম মানিয়া আমরা 'ভগ্নী'কে হ্রস্বত্ব দান করিলাম — 'ভগ্নী' হইল 'ভগ্নি'। কিন্তু উইলিয়াম সাহেব বলেন 'ভগ্নী'ই তৎসম, আবার তাহার দীর্ঘত্বের কথা চিন্তা করিতে হইল। 'ভাণ্ডার' শব্দটিরও একই অবস্থা। জানিতাম 'ভাণ্ডাগার' হইতে 'ভাণ্ডার'। সাহেব বলিলেন, তাহা নহে — 'ভাণ্ডার'ই সংস্কৃত।' (জ্যোতি ২০০৫ : ১৩৬-৩৭)

১১. এর বিপরীত উদাহরণও আছে। সংস্কৃত উৎসেও অনেক শব্দের অর্থ খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে খোঁজাখুঁজির একটা কারণ ছিল প্রচলিত বা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের সুবিধাজনক অর্থ-নির্ণয়; আর অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতপন্থীদের দাবি যে খোদ সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানেই সিদ্ধ নয়, সে প্রমাণ দাখিল করা। সাধারণভাবে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী বাংলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর এ অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

'মৃত্যুঞ্জয় শর্মা প্রভৃতিরা একদিন বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সংস্কৃত ভিতের উপর গড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। আজ তাহার ধ্বংসাবশেষও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরে ইংরেজিনবিশ বঙ্কিমচন্দ্রের দল যখন কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন তখন তাঁহাদের ষত্বণত্ব লইয়া সংস্কৃত কেল্লা হইতে অনেক গোলাগুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি আজও দুষ্ট ব্যাকরণের কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে। আজ কলঙ্ক-ভঞ্জনের চেষ্টা হইতেছে। ঘটে যে ছিদ্র ছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতেছে না কিন্তু তবু সে ঘট পূর্ণ হইয়া আছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না। জল তোলা চলিতেছে বটে কিন্তু কোডাক্ ক্যামেরার দ্বারা ধরা পড়িয়াছে ছিদ্র আছে; সেটা একেবারে সপ্রমাণ হইয়া গেছে, জল পড়ুক না পড়ুক মাথা হেঁট করিতেই হইবে — কিন্তু আমি বলিতেছি ছিদ্র সারিবে না, তবু কলঙ্ক মোচন হইবে।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২৫৪)

১২. রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনায় এ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের ভূমিকা-মন্তব্যে তিনি লিখেছেন: 'এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারো কারো অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে'। (রবীন্দ্রনাথ ২০০৬/১৩ : ৫৯৬)

১৩. মনসুর মুসা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব অনুযায়ী আসলেই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, এক. 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ' নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; দুই. 'যতগুলো উপভাষা প্রচলিত আছে' — কথাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা দুরূহ। তাঁর সিদ্ধান্ত :

সুতরাং যাচাইকরণ-যোগ্যতার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ সম্ভবপর না হলেও কিঞ্চিৎ জটিল ব্যাকরণ কিংবা কিঞ্চিৎ পরিব্যাপ্ত ব্যাকরণ যে লেখা যায় না, তা নয়। সে অর্থে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন বা ধারণার আংশিক বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। অবশ্য ইচ্ছা পূরণের ব্যাকরণের উপযোগিতা কী হবে, সেটা আগেই ভেবে কাজে হাত দেওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ সব ব্যাকরণ একই সঙ্গে নির্মাণ করা দুঃসাধ্য, এবং সে ধরনের ব্যাকরণ যাচাইকরণের অসুবিধার কারণে 'বৈজ্ঞানিক' হবে না। (মনসুর ১৯৯১ : ২১)

এ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবকে খুব আক্ষরিকভাবে বিচার করা হয়েছে। তাঁর অন্য রচনা ও মতের সাপেক্ষে এই প্রস্তাবের আভ্যন্তর প্রেরণা ও চাওয়াটি খতিয়ে দেখা হয়নি। বিপরীতে 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ভাষাবিজ্ঞানে'র প্রচলিত বিজ্ঞান-কাঠামোকে স্থির ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষার পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আসলে 'প্রমিত বাংলা'র কথাই বলেছেন। কিন্তু 'প্রমিত' কথাটির মধ্যে বিশেষ স্থান ও সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির যে অগণতান্ত্রিক আধিপত্য থাকে, তা যথাসম্ভব কমিয়ে এনে, ভাষার প্রাথমিক বিধিবদ্ধকরণকে যথাসম্ভব বিশদ,

গ্রহণযোগ্য ও গণতান্ত্রিক করাই তাঁর প্রস্তাবের নিহিত সুর। সে ব্যাকরণ একটি না হয়ে অনেকগুলো হতে পারে, বিদেশিদের জন্য বা শিশুর জন্য হতে পারে; দাপ্তরিক কাজ ও সামাজিক ব্যবহারের জন্য হতে পারে — তার কোনো গণ্ডি তিনি ঠিক করে দেননি। কাজটি একবার হবে তারও কোনো মানে নেই। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, এটা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। কাজটি কঠিন, এবং আক্ষরিক অর্থে করা সম্ভব নয় — এজন্য একে অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না।

১৪. মনসুর মুসা 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি' (মনসুর ১৯৯১: ১৭)। এ তথ্য যথার্থ নয়। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধ ছাড়াও ১৩২৬ বঙ্গাব্দে রচিত 'বাংলা কথ্যভাষা' প্রবন্ধে প্রসঙ্গটি আবার আলোচিত হয়েছে :

'বাংলা শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত উচ্চারণগুলির তুলনা আবশ্যক। অনেক বাংলা শব্দের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া যায় না। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারিত শব্দগুলি মিলাইয়া দেখিলে সেই মূল ধরিতে পারা সহজ হইতে পারে। তাহা ছাড়া উচ্চারণতত্ত্বটি শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। স্বর ও ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির কী নিয়মে বিকার ঘটে তাহা ভাষাতত্ত্বের বিচার্য। এজন্যও ভিন্ন জেলার উচ্চারণের তুলনা আবশ্যক।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ২২৩)

বোঝা যায়, এ প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণচিন্তার অংশবিশেষ নয়, বরং সমগ্রের ভিত্তি।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

জ্যোতিভূষণ চাকী ২০০১, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, ২য় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

জ্যোতিভূষণ চাকী ২০০৫, 'প্রবর্তক-নিবর্তক-সংবাদ', *ভাষাভাবনা* (বাংলা ভাষা নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক), তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা।

দেবেশ রায় ১৯৮৭, *আঠার শতকের বাংলা গদ্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা।

নির্মল দাশ ২০০০, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, ২য় সংস্করণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

নৈঋতা ভট্টাচার্য ২০১০, 'ব্যাকরণের রকমভেদ, ব্যাকরণের ভিন্নতা', *আলোচনাচক্র* ২৯, সম্পাদক : চিরঞ্জীব শূর, অতিথি সম্পাদক : প্রবাল দাশগুপ্ত, আগস্ট ২০১০, কলকাতা।

পবিত্র সরকার ২০০৩, *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রবাল দাশগুপ্ত ১৩৯৪, 'লোহারাম শিরোরত্নের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ'', *জিজ্ঞাসা*, শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা, কলকাতা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৭৭, *বাগর্থ*, ৩য় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৩৩৯, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, কলিকাতা।

মনসুর মুসা ১৯৯১, *ভাষাচিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান ১৯৯৪, 'বাঙালীর ব্যাকরণ চিন্তা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', *বাঙালির বাঙলাভাষা চিন্তা*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

মানোএল দা আসসুম্পসাঁও ১৯৩১, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯৯৩, *রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫, *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) ২০১১/১, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পাদিত) ২০১১/২, *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২, *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৬, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (আঠার খণ্ড), ৩য় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩৫৬, *রামেন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।

সরস্বতী মিশ্র ২০০০, *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সিরাজুদ্দীন আমেদ ২০০৬, 'বাংলা ব্যাকরণের সমাজতত্ত্ব', *প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ ২*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৯/ক, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০০০/বি, *রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৮, *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত) ২০০২, *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ : ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Chatterji, Suniti Kumar 2002, *The Origin and Development of the Bengali Language*, 3rd impression, Rupa & Co, New Delhi.

Philipson, Robert 2003, *Linguistic Imperialism*, 6th impression, Oxford University Press.

Qayyum, Muhammad Abdul 1982, *A Critical Study of the Early Bengali Grammar*, The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Thiong'o, Ngugi Wa 2007, *Decolonising the Mind*, Worldview Publications, Delhi.

Ganguli, Syamacharan 1990, 'Bengali, Spoken and Written', *Akademi Potrika 3*, Poshcimbongo Bangla Akademi, Calcutta.